বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে

সুপেয় পানির অধিকার ও বাস্তবতা

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানির সংকট দীর্ঘদিনের। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবন যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পানি সংকটের নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। বাংলাদেশ ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন ফর প্রোটেকশন অফ দ্যা কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন এনভায়রনমেন্ট অন ল্যান্ড বেইজড অ্যাক্টিভিটিজ-এ সুপেয় পানির ঘাটতিকে উপকূলীয় ঝুঁকির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি বলে বিবেচনা করা হয়েছে। ভূ-রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলকে বিস্তৃতভাবে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়- দক্ষিণ পূর্ব উপকূল, মধ্য-উপকূল এবং দক্ষিণ পশ্চিম উপকূল। সুপেয় পানির সমস্যা পুরো উপকূল জুড়ে বিস্তৃত, এই সমস্যা গুরুতর এবং বছরজুড়ে চলমান। বিশেষ করে সমুদ্র তীরবর্তী অবস্থান, অপ্রতুল প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সীমিত প্রাকৃতিক সম্পদের অতিরিক্ত এবং অপরিকল্পিত ব্যবহার ইত্যাদি কারণে এই মুহূর্তে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর সুপেয় পানি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিপদাপন্নতা খুবই ভয়াবহ। প্রয়োজনের তুলনায় কম বৃষ্টিপাত, নদীর নাব্যতা হ্রাস, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, মাটি ও পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধিসহ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ নানামুখী প্রভাব এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানির সংকট দেখা দিচ্ছে ।

প্রচ্ছদের মূল ছবি : রফিকুল ইসলাম মন্টু

পানি সংকটের সাম্প্রতিক চিত্র

বাংলাদেশের উপকূলবর্তী ১৯টি জেলায় প্রায় ৩ কোটি ৯০ লাখ মানুষের বসবাস। আধারযোগ্য পানি সংগ্রহ করতে পারেন না এদের প্রায় ৩ কোটি মানুষ এবং দেড় কোটি মানুষ মানুষ ভূ-গর্ভস্থ লবণাক্ত পানি পানে বাধ্য হচ্ছেন।[১] ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় আইলার প্রভাবে দক্ষিণ উপকূলের অনেক পানির আধার নষ্ট হয়ে গেছে। উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর খাবার পানি জোগাড়ের উৎস মূলত: ভূ-গর্ভস্থ পানি, ভূ-উপরিস্থ পানি, বৃষ্টির পানি, পুকুর ও নদীর পানি। ভূ-উপরিস্থ পানির উৎস, যেমন পুকুরের পানির পরিমাণ, গুনাগুণ ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে দক্ষিণাঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৭০০ মিমি যার ৮০ শতাংশই জুন-সেপ্টেম্বর এই চার মাসে হয়।[২,৩] জমাকৃত বৃষ্টির পানি কতদিন পানের উপযোগী থাকবে তা আধারের উপাদান, ব্যবস্থাপনা ওপর নির্ভরশীল।[৪] অন্যদিকে বৃষ্টি কমে এলে পুকুরের পানিও শুকিয়ে আসে- গুণগতমান নষ্ট হয়। ফলে খাবার পানির জোগানে এ অঞ্চলের মানুষদের একেক ঋতুতে একেক উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয়।

শুকনো মৌসুমে উপকূলীয় এলাকায় সামান্য খাবার পানির জন্যও হাহাকার শুরু হয়। অধিকাংশ নলকূপে পানি ওঠে না। আবার যা পানি আসে তা লবণাক্ত, সাথে রয়েছে মাত্রাতিরিক্ত আয়রন ও আর্সেনিক যা পানের উপযোগী নয়। দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় গভীর নলকূপ বসাতে প্রায় ৭০০ থেকে ১২০০ ফুট গভীরে যেতে হয়। পলিমাটির আধিক্য, অধিক লবণাক্ততা এবং পাথরের উপস্থিতির কারণে অনেক সময় নলকূপ স্থাপনই সম্ভব হয় না। সাতক্ষীরা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলের তথ্য মোতাবেক, উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরায় ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ৭০০ ফুট পর্যন্ত নেমে গেছে। ফলে জেলার ২৫ হাজার সরকারি টিউবওয়েলে এখন আর পানি উঠছে না। কিছু কিছু এলাকায় সামর্থ্যবান মানুষেরা ১২০০ ফুটেরও বেশি গভীর নলকূপ বসিয়ে নিজেদের চাহিদা মেটাচ্ছেন, যা অধিকাংশ সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে সুপেয় পানির সংকট বিষয়ে একটি গবেষণায় দেখা যায়, এ অঞ্চলের মানুষের সুপেয় পানির জন্য পিএসএফ (পুকুর পাড়ের বালির ফিল্টার) এর ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল। বাকিদের একটা বড় অংশ সরাসরি পুকুর থেকে পানি সংগ্রহ করছেন। বৃষ্টির পানি বা নলকূপ ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা এক্ষেত্রে নগণ্য।[৫]

ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষ পানীয় জলের ব্যবস্থাপনায় পুকুর একটি অন্যতম উৎস। অতীতে বৃষ্টির পানির আধার হিসেবে বেশি গভীরতার পুকুর খনন করা হতো। নোনাপানির অনুপ্রবেশ থেকে পুকুরের পানি নিরাপদে রাখতে নির্মাণ করা হতো শক্ত ও উঁচু পাড়। কিন্তু বিভিন্ন উন্নয়ন হস্তক্ষেপের প্রভাবে ১৯৮০ দশকের মাঝামাঝি থেকে গৃহস্থালি পানি সরবরাহের জন্য নির্ভরশীলতা ভূ-পরিস্থ আধার থেকে ভূ-নিম্নস্থ পানির দিকে ব্যাপকভাবে স্থানান্তরিত হয়।

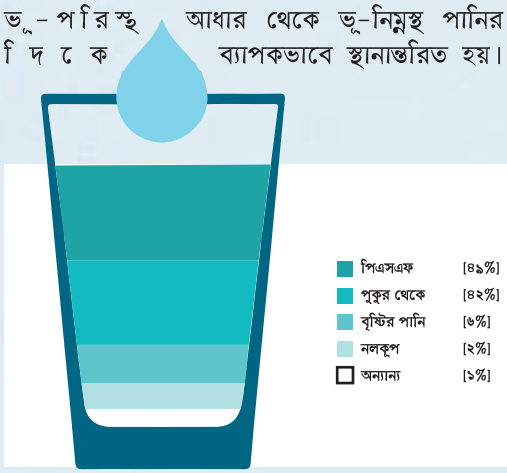

দুঃখজনকভাবে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নানা কারণে পরবর্তী দুই দশকে ভূ-গর্ভস্থ নিরাপদ খাবার পানির সহজলভ্যতা হ্রাস পায়। বাংলাদেশের সেচ ব্যবস্থা অনেকাংশে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীল, সাথে রয়েছে 'আধুনিক' চাষাবাদ পদ্ধতির জন্য অতিরিক্ত পানি খরচ। জাতিসংঘের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের দিক দিয়ে শীর্ষে থাকা দেশের তালিকায় এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ১০টি দেশ স্থান পেয়েছে। দেশগুলোর মধ্যে

1. Hoque, M.R. Access to Safe Drinking Water in Rural Bangladesh: Water Governance by DPHE 2009; BRAC University: Dhaka, Bangladesh, 2009
2. Abedin, M.A.; Habiba, U.; Shaw, R. Community Perception and Adaptation to Safe Drinking Water Scarcity: Salinity, Arsenic, and Drought Risks in Coastal Bangladesh. Int. J. Disaster Risk Sci. 2014, 5, 110–124
3. Chowdhury, N.T. Water management in Bangladesh: An analytical review. Water Policy 2010, 12, 32–51.
4. Amin, Md & Han, Mooyoung. (2009). Probable sources of microbial contamination of stored rainwater and its remediation.
5. Md. Moshiur RahmanM A AlumSyed Azizul HaqSyed Azizul Haq, Drinking Water Scarcity in the Southwest Coastal Area in Bangladesh, 2019
6. "Shamsudduha, Mohammad; Joseph, George; Haque, Sabrina S.; Khan, Mahfuzur R.; Zahid, Anwar; Ahmed, Kazi Matin U.. 2019. Multi-Hazard Groundwater Risks to the Drinking Water Supply in Bangladesh : Challenges to Achieving the Sustainable

বাংলাদেশের অবস্থান ৭ম। প্রতি বছর বাংলাদেশে ৩২ কিউবিক কিলোমিটার ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন হয়, যার ৯০ শতাংশই ব্যবহৃত হয় সেচকাজে এবং বাকি ১০ শতাংশ ব্যবহৃত হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং গৃহস্থালি ব্যবহারে।[৬] ভূ-গর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় বিপর্যয় ক্রমশ বাড়ছে।

গ্রীষ্মমন্ডলীয় জলোচ্ছ্বাস এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে নোনাপানির অনুপ্রবেশের কারণে দীর্ঘসময় ধরে উপকূলের কৃষকদের জীবিকা ও আয়ের বিপদাপন্নতা তৈরি হয়েছে। নব্বইয়ের দশক থেকে রপ্তানি বাজারে চিংড়ির ক্রমবর্ধমান চাহিদা তৈরির পর থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে বর্ধিষ্ণু লবণাক্ততার সুবিধা নিয়ে বহিরাগত ব্যবসায়ীরা অনৈতিক ক্ষমতাপ্রয়োগ এবং স্থানীয় বড় জমির মালিকদের সাথে যোগসাজশে ধান এবং অন্যান্য ফসল চাষকে সরিয়ে নোনা পানির চিংড়ি চাষ করতে শুরু করে। ফলে পরবর্তী দশ বছরে সেখানকার প্রায় শতভাগ কৃষিজমি লবণাক্ত পানির চিংড়ির খামারে পরিণত হয়েছে। মিঠা পানির উৎস পুকুরগুলোও এই

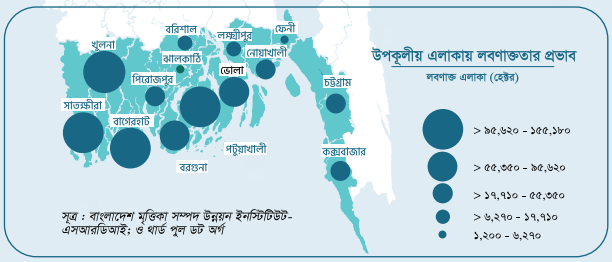

চিংড়ি চাষের আওতায় চলে যায়। এবং এই চর্চা এখনো অব্যাহত রয়েছে। ভূ-উপরিস্থ ভূমি এবং জলাধারে স্থায়ীভাবে লবণাক্ত পানি জমে থাকার ফলাফল হিসেবে মাটি এবং ভূ-গর্ভস্থ পানিতে চরম লবণাক্ততা তৈরি হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের পানির অনুপ্রবেশ এবং দুর্বল পানি ব্যবস্থাপনা ও চিংড়ি চাষের মতো মনুষ্যসৃষ্ট কারণে মারাত্মক লবণাক্ত হয়ে উঠেছে। লবণাক্ততা ইতোমধ্যে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটারেরও বেশি ভেতরের অঞ্চলে প্রবেশে করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা আরও বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এক গবেষণা বলছে, 'ভূ-গর্ভস্থ পানির লবণাক্ততা উপকূলের আশেপাশের বেশিরভাগ অঞ্চলে সহনীয় মাত্রার চেয়ে বহুগুণ বেড়েছে। বেশিরভাগ উপকূলীয় অঞ্চলে মূল বা দ্বিতীয় জলবায়ুতে লবণাক্ততার পরিমাণ (ক্লোরাইড গণনা) শুকনো মৌসুমে ১০৩-১২,৪৩৩ এবং বর্ষাকালে ৩৪ থেকে ১১,৩৬৬ পর্যন্ত থাকে।'[৭] জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মতে যেখানে পানযোগ্য প্রতি লিটার পানিতে লবণের সহনীয় পরিমাণ ০ থেকে ১ হাজার মিলিগ্রাম সেখানে বাংলাদেশের উপকূলে প্রতি লিটার পানিতে ১ হাজার থেকে ১০ হাজার মিলিগ্রাম লবণের উপস্থিতি রয়েছে।

তবে উপকূলীয় পানি সংকট নিরসনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারিভাবে গৃহীত কর্মসূচিগুলোতে কার্যকারিতা এবং স্থায়িত্বশীলতার অভাব রয়েছে। সুপেয় পানির প্রবেশগম্যতার উন্নয়নে ২০১৯ সালে ১৬০ মিলিয়ন জনগোষ্ঠীর প্রায় ৯৮.৫ শতাংশকে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ সরকার বৈশ্বিক নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু পানির গুণগত মান, নিকটবর্তিতা এবং পর্যাপ্ততার নির্দেশকগুলো আমলে নিলে এই অন্তর্ভুক্তি প্রায় ৪২.৫ শতাংশ হ্রাস পায়। বিবিএস ২০১৩ এর হিসাবও বলছে বাংলাদেশের ৯৮.৫ শতাংশ মানুষের সুপেয় পানির প্রবেশগম্যতা রয়েছে। কিন্তু এই গবেষণায় লবণাক্ততার বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অথচ এই ইস্যুগুলো গবেষণায় বিবেচনা করা হলে এই অনুপাতও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে।

পানীয় জলে লবণাক্ততার কারণে সৃষ্ট অন্যান্য সংকট

সুপেয় পানির কারণে সৃষ্ট সংকট

একদিকে রোজকার পানির প্রয়োজন মেটানোর লড়াই, অন্যদিকে রয়েছে লবণাক্ত পানি পানের ফলে উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্যঝুঁকি। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ডিপিএইচই) ২০১২ সালের একটি গবেষণা বলছে, উপকূলীয় অঞ্চলের ৬১ শতাংশ জনগোষ্ঠী গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যার মুখোমুখি। খাবার পানি, রান্নাবান্নাসহ দৈনন্দিন কাজে লবণাক্ত পানি ব্যবহারের ফলে অনেকেই উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন যার ফলে হৃদরোগ, স্ট্রোকসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন।[৮] ভূ-উপরিস্থ দূষিত পানি গ্রহণের ফলে এ অঞ্চলে ডায়রিয়া পেটব্যথা, জ্বরসহ বিভিন্ন রোগের প্রকোপ লেগেই থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শিশুমৃত্যুর পাঁচটি প্রধান কারণের চারটিই দূষিত পানিপানের সঙ্গে সম্পর্কিত। সুপেয় পানির অভাবে রোগ-ব্যাধির হার বাড়ছে, স্কুল এবং কর্মক্ষেত্রে উপস্থিতির হার হ্রাস পাচ্ছে, সামগ্রিক জীবনের গুণগত মানও উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে। সেই সাথে রয়েছে উচ্চমূল্যে পানি ক্রয়ের ফলে সৃষ্ট আর্থিক এবং দারিদ্র্য বৃদ্ধি, বিদ্যালয় কিশোরীদের ঝরে পড়া, নিজ ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যান্য স্থানান্তর, প্লাবনভূমি পরিবর্তনের কারণে বাস্তুস্থানে পরিবর্তন ও পানি বণিজ্যিকায়নের মতো সংকটগুলো ঘণীভূত হচ্ছে। এছাড়া বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'শুধু পানির কারণে মানুষের স্থানান্তর বেড়ে গেছে। মানুষ উপকূল ছেড়ে অন্য এলাকায় ভিড় করছে।'[৯]

সুপেয় পানির জন্য বাড়তি ব্যয়

সুপেয় পানির জন্য লড়াই উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবনে নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধুমাত্র একটু খাবারের পানি সংগ্রহ করতে নিয়মিত তাদের দিনের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময় ব্যয় হচ্ছে। শারিরিক পরিশ্রমের সাথে সাথে এতে করে তাদের গৃহস্থালি কাজকর্ম এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু একেক সময় এই সময় বা শ্রম দিয়েও পর্যাপ্ত এবং শতভাগ সুপেয় পানি আহরণ সম্ভব হচ্ছেনা। ফলে অনেক সময় পরিবারের চাহিদা মেটাতে পানি কিনতে হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে প্রতি লিটারে ন্যূনতম ৫০ পয়সা দিয়ে খাবার পানি কিনতে হচ্ছে, কোনো ক্ষেত্রে তা ৭০ পয়সা প্রতি লিটারও হয়ে থাকে। পানির জন্য অতিরিক্ত খরচ পরিবারগুলোর ওপর অতিরিক্ত অর্থনৈতিক চাপ তৈরি করছে।

থার্ড পোল-এর একটি প্রতিবেদন বলছে, দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাতক্ষীরার শ্যামনগরে বসবাসকারী বৃদ্ধা ব্রজাসুন্দরী স্থানীয় একটি ডিংকি ওয়াটার প্লান্ট মালিকের কাছ থেকে প্রতিবার ৬০ লিটার পানি ক্রয় করেন ৩০ টাকার বিনিময়ে (০.৩৫ মার্কিন ডলার)

ঢাকা ওয়াসা রাজধানীতে প্রতি ইউনিট (এক হাজার লিটার) পানি সরবরাহ করে ৮ দশমিক ৪৯ টাকা দরে। একই পরিমাণ খুলনাবাসীকে সেখানকার ওয়াসা দেয় সাড়ে চার টাকায়। কিন্তু সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার মানুষগুলো ২০ লিটার খাবার পানি কেনে ১০ টাকায়।[১০]

এবং এই পানি বহন করে আনতে তাকে পায়ে টানা রিকশার জন্য আরো ২০ টাকা (০.২৪ মার্কিন ডলার) ব্যয় করতে হয়। সব মিলিয়ে মাসে ব্রজসুন্দরীকে পানির জন্য ৪০০ টাকা (৪.৭২ মার্কিন ডলার) ব্যয় করতে হয়, যা কিনা সরকারের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, একজন ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের গড় আয়ের ১০ শতাংশেরও বেশি। এবং পানির এই মূল্য শহরের তুলনায় উপকূলীয় এলাকায় ৪০ শতাংশ বেশি।[১১] ফলে উপকূলীয় পরিবারগুলো পানি ক্রয় বাবদ বাড়তি ব্যয় করতে গিয়ে পরিবারের অন্যান্য খরচ এবং দৈনিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদে পুষ্টিহীনতা এবং দারিদ্র্য তৈরি করে।

উপকূলীয় নারীর ওপর সুপেয় পানি সংকটের প্রভাব

উপকূলে পানি সংকটে নানামুখী সমস্যার ভুক্তভোগী নারীরা। অনিরাপদ পানি ব্যবহারের ফলে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বেশি আর এদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ত পানি গ্রহণ ও ব্যবহারের ফলে জরায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন ঝুঁকিতে পড়ছেন নারীরা, এর সাথে তলপেটে ব্যথা, সাদাস্রাব, ঘনঘন প্রশাব, যোনীপথে চুলকানি সহ বিভিন্ন সমস্যা তো আছেই। দীর্ঘদিন জরায়ুর

সমস্যায় ভুগলে তা ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। ফলে অনেককেই অল্প বয়সেই বাধ্য হয়ে জরায়ু কেটে ফেলতে হচ্ছে।[১২] স্ত্রীদের জরায়ু অপারেশনে ফেলে দেয়ার ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়েই স্বামীরা দ্বিতীয়বার অন্যত্র বিয়ে করার মতো ঘটনাও ঘটছে। বাংলাদেশের অন্যান্য যে কোনো অঞ্চলের তুলনায় উপকূলীয় অঞ্চলের গর্ভবতী নারীদের খিঁচুনি এবং উচ্চরক্তচাপের হার বেশি। বর্ষাকালের তুলনায় অন্য মৌসুমে লবণাক্ততা বেশি থাকে ফলে খিঁচুনি এবং উচ্চ রক্তচাপের হারও এই সময়ে বেশি থাকে।[১৩]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে মানুষের সর্বোচ্চ মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করতে সার্বিকভাবে দৈনিক ৫০ থেকে ১০০ লিটার পানির প্রয়োজন হয়। কেবলমাত্র পানের জন্য একজন মানুষের ন্যূনতম ৫ লিটার পানি প্রয়োজন। [GLEICK] পরিবারে সদস্যদের পানির এই বিপুল চাহিদা পূরণে দূর-দূরান্ত থেকে মূলত: নারী এবং কিশোরীরা পানি সংগ্রহ করেন । কখনো পানি আনতে অপারগ হলে বা পানি না থাকার কারণে কম পানি পান করছেন পরিবারের নারীরাই। 'আসলে এখানকার মানুষদের যে পরিমাণ পানি পান করা উচিত সে পরিমাণ পানি তারা পান করেনা। শ্যামনগর উপজেলার ২৩ বছর বয়সী এক নারী বলেন, এখানে পানির খুব অভাব। তাই পানি পান করার আগে আমাকে চিন্তা করতে হয় কতটুকু পান করবো আর কতটুকু সংরক্ষণ করবো। এই নারী একটি চিংড়ি ঘেরে কাজ করেন। তার কর্মস্থলে পানি পানের কোনো ব্যবস্থাই নেই।'[১৪] দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে লম্বা সারিতে অপেক্ষা করে পানি আনতে গিয়ে নারীদের দিনের অনেকটা সময় নষ্ট করতে হয়। অনেকেই পানি বহন সংক্রান্ত অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে কোমর ও পায়ে ব্যথায় ভুগছেন। পানি সংগ্রহের জন্য পরিশ্রমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের নারীদের মৃত শিশু জন্মদানের হার দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ।[১৫]

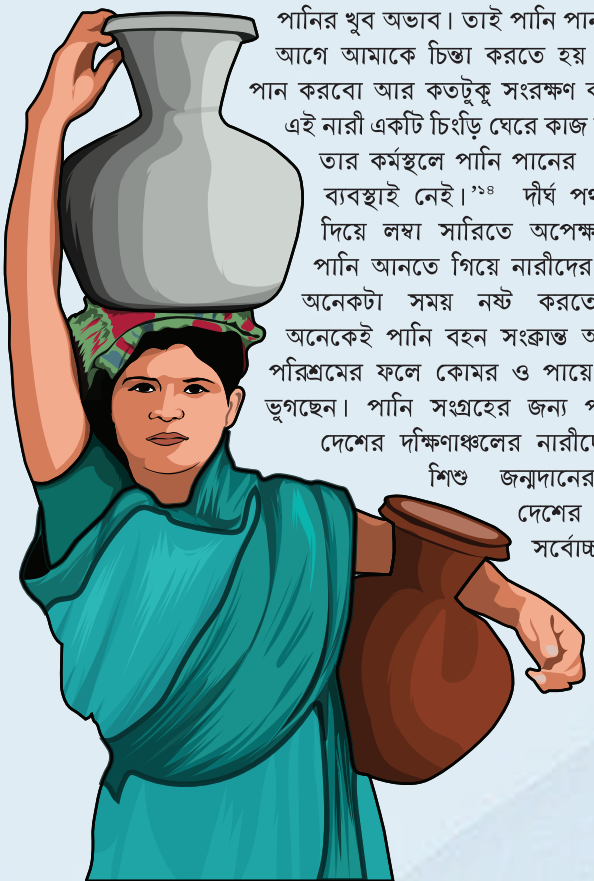

শারিরিক চাপের পাশাপাশি সুপেয় পানির প্রাপ্তির অভাবে নারীরা মানসিক চাপেরও মুখোমুখি হচ্ছেন। পরিবারের জন্য সময়মতো ও পর্যাপ্ত পানি সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনাজনিত উদ্বেগ তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকেও ক্ষতিগ্রস্থ করছে। পানি নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় নির্জন পথে বা অন্ধকার নেমে এলে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এমন ঘটনার নজির রয়েছে। আবার পানি সংগ্রহের জন্য কেউ কেউ বাধ্য হয়ে শিশুদের অরক্ষিত অবস্থায় বাড়ি রেখে যান।[১৬] ফলে এই শিশুদের জন্য বিভিন্ন ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। আবার পানি সংগ্রহে দেরির কারণে বাড়ি ফিরতে সময় লেগে গেলে কিংবা গৃহস্থালি কাজে দেরি হলেও এই নিয়েও পারিবারিক কলহ, নিপীড়নের সূত্রপাত হচ্ছে।

আইনী বাধ্যবাধকতা এবং জাতীয় ও বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতি

সুপেয় পানি মানুষের জীবনযাপনের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান যার সাথে সকল মৌলিক অধিকারসমূহ ওতপ্রোভাবে জড়িত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫-তে সকল নাগরিকের 'অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা' নিশ্চিত করাকে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, আহরণ, বিতরণ্ ব্যবহার, সুরক্ষা ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালে প্রণীত বাংলাদেশ পানি আইনের ৩ (২) তে পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ব্যবহার্য পানিসহ সুপেয় পানির অধিকারকে সর্বাধিকার হিসেবে বিবেচনার কথা বলা হয়েছে।

২০১৮ সালে অনুমোদিত বাংলাদেশ ডেলটা প্লান বা বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর উল্লেখযোগ্য বিষয় সুপেয় পানি। এর নির্দিষ্ট অভিষ্ট নং-২ এ 'পানি নিরাপত্তা এবং পানি ব্যবহারে অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং ' এবং অভিষ্ট নং ৬ এ 'ভূমি ও পানি সম্পদের সর্বোত্তম সমন্বিত ব্যবহার নিশ্চিত করা'র ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার আওতায় চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত ৬টি হটস্পটের মধ্যে একটি হচ্ছে ২৭ হাজার ৭৩৮ বর্গকিলোমিটারের উপকূলীয় অঞ্চল- যেখানকার সমস্যা হিসেবে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ উপকূলীয় অঞ্চল নীতিমালা-২০০৫ এ বৃষ্টির পানি আহরণ ও সংরক্ষণকে উৎসাহিত করা, পানি সংরক্ষণে দীঘি ও পুকুর খনন এবং পানি শোধণের স্থানীয় প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করা, ভূ-গর্ভস্থ পানির টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, বিদ্যমান অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে পোল্ডারের মধ্যে যথাযথ পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যাতে করে মিঠা পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায় ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

জাতীয় পানি নীতিতে পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিদ্যমান সমস্যা মোকাবেলায় সরকারের নীতি হিসেবে

২০২১ সাল পর্যন্ত দেশের মাত্র ৩৯ শতাংশ মানুষ নিরাপদ পানি পায়

বৃষ্টির পানি সংরক্ষণসহ বিভিন্ন উপায়ে নিরাপদ সহজলভ্য খাবার পানির সুষ্ঠু যোগান নিশ্চিত করতে সহায়তা দান, পানি সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে সেচ ও নগরের পানি সরবরাহের জন্য সকল ধরণের ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির সংযোজক ব্যবহার নিশ্চিত করা, সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহকে পর্যায়ক্রমে এদের প্রদত্ত সেবার জন্য মূল্য আরোপের ক্ষমতা অর্পণ করাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশুদ্ধ পানি সকল ধরণের মানবাধিকারের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। ২০১০ সালে সুপেয় পানি পাওয়ার অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে ঘোষণা দেয় জাতিসংঘ। সুপেয় পানির মানবাধিকারের স্বীকৃতির এরই মধ্যে পার হয়েছে দশ বছরেরও বেশি সময়, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ গ্রহণের পেরিয়েছে পাঁচ বছরেরও বেশি। জনগণের পানির চাহিদা পূরণে সরকারেরও কতিপয় বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অথচ, বাংলাদেশের প্রায় তিন কোটি মানুষ এখনো নিরাপদ পানির সুযোগ সুবিধা পায় না যাদের অধিকাংশই উপকূলীয় ও পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ [ইউনিসেফ]।

উপকূলীয় সুপেয় পানি সংকট নিরসনে সরকারি উদ্যোগ

উপকূলীয় পানি সংকট নিরসনে সরকার গৃহীত নানা পদক্ষেপ রয়েছে। সরকারি উদ্যোগে উপকূলজুড়ে পুকুর খনন, পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ বা পুকুরের পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া) স্থাপন, টিউবওয়েল স্থাপন এবং বৃষ্টি পানি ধরে রাখার জন্য নানা ধরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০২০ সাথে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় 'সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ' নামক একটা প্রকল্প অনুমোদিত হয়। এছাড়াও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে সরকার উপকূলীয় এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু, জাতীয় বাজেট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০২১-২২ অর্থবছরে এডিপির মোট বরাদ্দের হিসাবে ওয়াশ খাতে বরাদ্দ ছিল ৫ দশমিক ৪৪ শতাংশ বা ১৪ হাজার ৫১৭ কোটি টাকা। এই অর্থবছরে অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওয়াশ খাতে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এবং এসব এলাকায় বরাদ্দ ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫ বছর আগের তুলনায় ৭২ শতাংশ কমেছে। কিন্তু, বাস্তবতা হলো, ২০২১ সাল পর্যন্ত দেশের মাত্র ৩৯ শতাংশ মানুষ নিরাপদ পানি পায়, তাই নিরাপদ পানি নিশ্চিত করার জন্য বাড়তি কর্মসূচি এবং বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন।[১৭]

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ও উপকূলীয় পানি সংকট

সুপেয় পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। বর্তমানে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের জন্য কাজ করছে। তবে , সুপেয় পানি বিষয়ে এমডিজি থেকে এসডিজি লক্ষ্য এবং বাস্তবায়ন কৌশল ভিন্ন। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার লক্ষ্য- ৭সি তে '২০১৫ সালের মধ্যে নিরাপদ সুপেয়

Development Goals. Policy Research Working Paper;No. 8922. World Bank, Washington, DC. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31994 License: CC BY 3.0 IGO."

7. Distribution of Groundwater Salinity and Its Seasonal Variability in the Coastal Aquifers of Bengal Delta, Anwar Zahid and Khurshid Jahan, 2013
8. রাজু নুরুল, উপকূলে খাওয়ার পানির সংকট ও তার টেকসই সমাধান, দৈনিক বণিক বার্তা, মে ২৯, ২০২১
9. দীলিপ কুমার দত্ত, বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার: শুধু সুপেয় পানির অভাবে উপকূলের মানুষ এলাকা ছাড়বে, দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ মার্চ ২০২২
10. লবণাক্ত পানির ব্যবহারে জরায়ু হারাচ্ছেন উপকূলের নারীরা, জেসমিন পাপড়ি, জাগো নিউজ, প্রকাশ ২৩ আগস্ট ২০২০,

পানি এবং স্যানিটেশনের প্রবেশগম্যতাহীন জনসংখ্যার অনুপাত অর্ধেকে নামিয়ে আনা'র কথা বলা হলেও, এসডিজি লক্ষ্য ৬-এ ২০৩০ সালের মধ্যে নিরাপদ ও স্বল্পমূল্যের খাবার পানিতে সকলের সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক প্রবেশাধিকার, পানি ব্যবহার দক্ষতার উন্নয়ন এবং পানি-সংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সুপেয় পানির টেকসই সরবরাহ, পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বরোপ করা হয়েছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) লক্ষ্য ৬ এর আওতায় নির্দেশকগুলো হচ্ছে :

৬.১: ২০৩০ সালের মধ্যে, নিরাপদ ও স্বল্পমূল্যের খাবার পানিতে সকলের সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক প্রবেশাধিকারের লক্ষ্য অর্জন;

৬.৪: ২০৩০ সালের মধ্যে সকল খাতে পানি ব্যবহার দক্ষতার প্রভূত উন্নয়ন এবং পানি-সংকট সমস্যার সমাধানকল্পে সুপেয় পানির টেকসই সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং পানি সংকটের ভুক্তভোগী মানুষের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা;

৬.৬: ২০২০ সালের মধ্যে পর্বত, অরণ্য, জলাভূমি, নদী, ভূগর্ভস্থ জলাধার (পানিস্তর) ও হ্রদসহ পানিসংশ্লিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবন;

৬.খ : পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে সমর্থন ও সহযোগিতা জোরদার করা।

তবে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক নিরাপদ ও স্বল্পমূল্যের খাবার পানিতে প্রবেশাধিকারের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। মূলত সুপেয় পানি দুষ্প্রাপ্যতা, দূরবর্তী এবং নিম্ন আয়ের অঞ্চলগুলোতে এই সংকট প্রকট। ২০১৯ সালে একটি গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের মত জনগোষ্ঠীর মাত্র ১২ শতাংশের নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি পরিষেবায় প্রবেশগম্যতা রয়েছে এবং ৬৪ শতাংশ মানুষের প্রাথমিক পানিতে প্রবেশগম্যতা নেই।[১৮] এখনো পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে পানির প্রাপ্যতা এবং প্রবেশগম্যতা ঋতুর ওপর নির্ভরশীল। গবেষণা বলছে উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ব্যবহারকারী পরিবারগুলো মাত্র ছয় মাস জমাকৃত পানি দিয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা মেটাতে পারেন এবং বাকি সময়ে তাদের অন্যান্য অনির্ভরযোগ্য বা

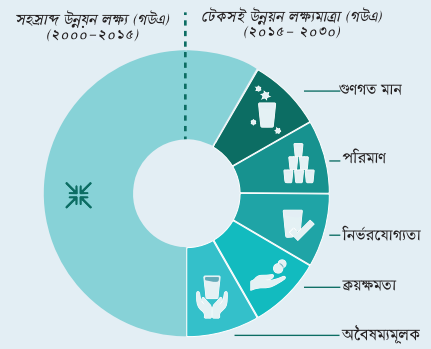

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (MDG) *লক্ষ্য ৭সি থেকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য* (SDG) *লক্ষ্য ৬.১-এ স্থানান্তর*

দূরবর্তী উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয়।[১৯]

এসডিজি'র আরেকটি অন্যতম নির্দেশক হচ্ছে, স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে সমর্থন ও সহযোগিতা জোরদার করা। কিন্তু, গ্রামীণ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকার পানি সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন করলেও এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পানির ব্যবহারকারীদেরই ওপর চাপিয়ে দেওয়া অপরিহার্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অন্তরায়। এই ধরণের ব্যবস্থা কার্যকর রাখার জন্য নিয়মিত পরিষ্কার করা, স্যান্ড বার পরিবর্তন, পুকুর সুরক্ষা এবং নিয়মিত মেরামত প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে কে দায়িত্ব নেবে, খরচ কিভাবে বহন করা হবে, ইত্যাদি অসুবিধার কারণে স্থাপনার কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়, এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর অকার্যকরতা স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়। উপকূলীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সুপেয় পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সরকার রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিংয়ের ওপর

11. https://www.thethirdpole.net/en/climate/safe-water-costs-40-times-more-in-coastal-bangladesh-than-cities/
12. লবণাক্ত পানির ব্যবহারে জরায়ু হারাচ্ছেন উপকূলের নারীরা, জেসমিন পাপড়ি, জাগো নিউজ, প্রকাশ ২৩ আগস্ট ২০২০
13. প্রাগুক্ত
14. https://www.thethirdpole.net/en/climate/safe-water-costs-40-times-more-in-coastal-bangladesh-than-cities/
15. জলবায়ু অভিযোজন, নারী ও প্রজনন স্বাস্থ্য, পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক-প্রান, ২০১৪
16. বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় সুপেয় পানির সংকট, Presented on the WaterHackathon 2022, By Mohon Kumar Mondol, 7th-8th June, Khulna
17. https://www.risingbd.com/economics/news/409679
18. Drinking Water Insecurity in Southwest Coastal Bangladesh: How Far to SDG 6.1? [https://www.mdpi.com/2073-4441/13/24/3571/htm]
19. প্রাগুক্ত
20. প্রাগুক্ত

গুরুত্বারোপ করে। কিন্তু জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের দেয়া তথ্যমতে একটি রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং স্থাপনের খরচ প্রায় ২৯ হাজার টাকা।[২০] এর কার্যকারিতা চলমান রাখতে নিয়মিত রক্ষণবেক্ষণ এবং পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। উপকূলীয় অধিকাংশ মানুষের জন্য এই ধরণের উচ্চ বিনিয়োগ প্রায় অসম্ভব এবং দৈনন্দিন পানীয় জল পেতে এই পরিমাণ অর্থ খরচ করাও অবাস্তব। তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সুপেয় পানি নিশ্চিত করা জন্য এই ধরণের ব্যবস্থা এসডিজি লক্ষ্যমাত্রার অর্জনে একটি বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ।

প্রস্তবনা

১. উপকূলীয় জেলাগুলোতে অঞ্চলভিত্তিক পানি সংকটের ধরণ তথ্যায়ন এবং সুপেয় পানির সর্বজনীন, ন্যায্য ও টেকসই প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে সরকারি বরাদ্দ এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে; পানি পরিষেবাকে আরো সাশ্রয়ী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

২. গ্রামাঞ্চলে সাধারণত অধিকাংশ বাড়িতেই কয়েকটি পরিবার মিলে একটি পুকুর ব্যবহার করেন; এই পুকুরগুলোতে পিএসএফ স্থাপনের মাধ্যমে বাড়ির আঙ্গিনায়, হাতের নাগালে সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;

৩. বর্তমান প্রেক্ষাপট ও হালনাগাদ তথ্যেরভিত্তিতে উপকূলীয় এলাকায় পানি পরিষেবার জন্য বিদ্যমান নীতি, চর্চা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা সংশোধন করার মাধ্যমে পানি পরিষেবার শতভাগ কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে হবে;

৪. পানযোগ্যতা নিশ্চিত করতে পানি জীবাণুমুক্তকরণ অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে;

৫. সুপেয় পানি সংকট মোকাবেলায় লোকজ জ্ঞানের তথ্যায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং এর শতভাগ কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পানি অধিকার সুরক্ষায় পদক্ষেপ নিতে হবে;

৬. নিরাপদ ও বিশুদ্ধ সুপেয় পানিতে উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর সর্বজনীন প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পর্যাপ্ত বরাদ্দের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৭. উপকূলীয় অঞ্চলে পানি সংগ্রহে নারীরা যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন, সেসব সংকট বিবেচনায় রেখে নারীর জন্য সুরক্ষামূলক পানি পরিষেবা ও ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নিতে হবে;

৮. উপকূলীয় এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার বন্ধ করা, এলাকাভিত্তিক বড় বড় পুকুর, খাল, জলাশয় খনন করে তাতে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা, খাসজমিতে মিঠা পানির আধার তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে;

৯. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সার্বিক অংশগ্রহণ ও সামাজিক জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সুপেয় পানির সংকট, সংকটের ধরণ, ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো বিষয়ক সকল তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং সকলের জন্য তা উন্মুক্ত থাকতে হবে।

সর্বপরি, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে ২০৩০ সালের মধ্যে পানির প্রাপ্যতা, প্রবেশগম্যতা, গুণগত মান এবং পানি ক্রয়ের আর্থিক সক্ষমতা এই ৪টি দিক নিশ্চিত করতে হবে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

#পানি_অধিকার_প্রচারাভিযান

এই নীতিপত্রটি 'পানি অধিকার প্রচারাভিযান' এর আওতায় প্রকাশিত

প্রকাশ : জুলাই ২০২২
সহায়তা : একশনএইড বাংলাদেশ
যোগাযোগ : পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক- প্রান
www.pranbd.org